গোরু ও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি

রাজকুমার চক্রবর্তী

ফেসবুকে একটি পোস্ট দেখছিলাম–

বাঘ বাঁচাও বললে পরিবেশপ্রেমী।
হরিণ বাঁচাও বললে পরিবেশপ্রেমী।
আর গোরু বাঁচাও বললেই সাম্প্রদায়িক।

যে-বন্ধু পোস্টটি শেয়ার করেছেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানি। মোটেই সম্প্রদায়বিদ্বেষী নন। অসচেতনভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারের ফাঁদে পড়ে গেছেন।

পোস্টটি এমনিতে বুদ্ধিদীপ্ত–গো–রক্ষার সপক্ষে পরিবেশের দোহাই। মুশকিল হল, গোমাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যে–প্রচার ও হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছে, তা কিন্তু মোটেই পরিবেশবাদী কারণে নয়, তার পিছনে পরিস্কার হিন্তত্ববাদী রাজনীতি রয়েছে : গোরু হিন্দুদের কাছে পবিত্র প্রাণী ও মাতা হিসেবে পূজিত। সুতরাং, হিন্দুর এই দেশে মুসলমানরাও –বা অন্য ধর্মের মানুষেরা – গো–হত্যা করতে পারবে না। বলাই বাহুল্য, এ হল জোর যার মুলুক তার –এর ভাষ্য, বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা অস্বীকার ও দমন কের দেশজুড়ে নিজেদের ইচ্ছামতো একটি একীভূত সংস্কৃতি–হিন্দুরাষ্ট্র–চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা।

এখানে মনে রাখা দরকার, গো–রক্ষা আন্দোলন কোনো হালফিলের ব্যাপার নয়, এর ইতিহাস বেশ পুরোনো এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই গণসমাবেশ (mobilization)–এর একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তা উপস্থিত। মধ্যযুগেই গোরু হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি পবিত্র প্রতীক। ব্রাহ্মণ ও গোরুর রক্ষাকর্তা রূপে শিবাজি নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। শিবাজি অবশ্য সামপ্রদায়িক বা মুসলমান–বিদ্বেষী ছিলেন না। আদতে তিনি ছিলেন নিম্নবর্ণজাত মানুষ (শূদ্র), ব্রাহ্মণ ও গো–রক্ষার কথা বলে তিনি হিন্দুসমাজের উপরের দিকে (ক্ষত্রিয় হিসেবে) সম্মানিত আসন পেতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর রাজাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। গোরুর প্রতীককে ব্যবহার করে মুসলমান–বিদ্বেষী রাজনীতির কথা তিনি ভাবেননি। গো–রক্ষার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গণসমাবেশ আধুনিক কালেই প্রথম দেখা গিয়েছিল। ১৮৭০–এর দশকে শিক কুকা সম্প্রদায় গোরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রথম আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তী দশকে গো–রক্ষা আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মসুটির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোরক্ষিণী সভা। এরপর থেকে ক্রমশ গোরু হয়ে ওঠে সংগঠিত ও জঙ্গি হিন্দুত্বের প্রতীক।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মের কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল না। আধুনিক কালে এসেই সংগঠিত হিন্দুধর্ম নির্মাণের একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়। নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-বিশিষ্ট ও স্তরে-স্তরে বিভক্ত বৃহৎ জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য একটি অভিন্ন প্রতীকের প্রয়োজন হয়েছিল। দেখা যায়, গোরু হতে পারে সেই প্রতীক-ভারতের সর্বত্র গোরু যেমন পাওয়া যায়, তেমনই গৃহপালিত ঐ প্রাণীটির প্রতি কৃষিপ্রধান সমাজের মমত্ববোধ খুব স্বাভাবিক, গোরু হিন্দুত্বের প্রতীক আরও ঐ কারণে যে-খ্রিস্টান ও মুসলমানদের কাছে গোরু বধ্য বা হত্যা–যোগ্যে প্রাণী, কিন্তু হিন্দুত্বের কাছে তা পবিত্র। যে-কোনো 'identiy-politics'-ই অপর বা প্রতিপক্ষ খোঁজে, গোরু নামক প্রতীকটিকে ব্যবহার করে খুব-সহজেই আমরা-ওরা চিহ্নিত করা যায়। বহুধাবিভক্ত হিন্দু সমাজে এর চেয়ে উপযোগী ও সংবেদনশীল আর কোন্ প্রতীকই-বা হতে পারে, যাকে গণসমাবেশের কাজে ব্যবহার করা যায়?

হিন্দুত্ববোধ বা হিন্দু জাতীয়তাবোধ একটি আধুনিক বিষয় –এ নিছক অতীতের পুনরুজ্জীবন নয়, বরঞ্চ বিশেষ বিশেষ প্রতীক ও ঐতিহ্যাকে ব্যবহার করে (একইভাবে, কিছু ঐতিহ্য বর্জন করে) অতীতের একটি নির্মাণ (constrnction)। এই নির্মিত-অতীত বলাই বাহুল্য বাস্তবের অতীত নয়। হিন্দুত্বের এই নির্মিত প্রকল্পটি দাবি করে –হিন্দুধর্মে গো-হত্যা চরম পাপ এবং গোরু পবিত্র জ্ঞানে পূজিত। বাস্তব ইতিহাস কিন্তু এ কথা বলে না।

ভারতীয়রা যে প্রাচীনকালে গো-হত্যা করত-বলি হিসেবে এবং খাদ্যের প্রয়োজনে-এবং লোভনীয় খাদ্য হিসেবে গোমাংসের কদর ছিল, তার বহু দৃষ্টান্ত বেদসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। আমরা জানি, আর্যরা ভারতে এসেছিলে যাযাবর ও পশুপালক হিসেবে, গো-ধন তাদের কাছে যেমন আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তেমননই দেবতাদের উদ্দেশে তা উৎসর্গও করা হত। ঋগ্বেদ-এর সর্বাগ্রহণ্য দেবতা ইন্দ্রের বিশেষ পছন্দ ছিল ষাঁড়ের মাংস, অগ্নি ষাঁড় ও বন্ধ্যা-গোরুর পাশাপাশি ঘোড়ার মাংসও ভালোবাসতেন। রাজসূয় ও বাজপেয় যজ্ঞে প্রচুর সংখ্যায় গোরু বলি দেওয়া হত। এছাড়াও বিবাহ অনুষ্ঠান ও অতিথি সেবার জন্য গোহত্যার বহুল চল ছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রথা প্রাচীন কালে জনপ্রিয় ছিল, যার অর্থ সম্মানীত অতিথিকে দই ও মধুর সঙ্গে মাংস (গোমাংস যার অন্তর্ভুক্ত ছিল) দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো। অতিথির প্রতিশব্দ হিসেবে পাণিনি গোঘ্ন শব্দটি উল্লেখ করেছেন। শব্দটির অর্থ গো-হত্যা। অবশ্য ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ-এ অঘ্ন শব্দটি ও আছে। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা হিসেবে দান করা গোরু ছিল অবধ্য। সাধারণভাবে দুগ্ধবতী গোরুও হত্যা করা হত না। এও উল্লেখ্য যে সামগ্রিকভাবে গরুকে অবধ্য ও পবিত্র (Holy) বলে বিবেচনা না করা হলেও গো-

জাত দ্রব্যসমূহ যেমন, দধি, দুধ, ঘি, গোবর, গোমূত্র, শুদ্ধিকরণ (purification)-এর মাধ্যম হিসেবে ধর্মীয় ক্রিয়াচারে স্বীকৃত হয়েছিল।

বৈদিক সমাজ যখন পশুপালক সমাজ থেকে কৃষিজীবী সমাজে রূপান্তরিত হতে শুরু করে, তখন বিপুল পরিমাণ গোসম্পদ যজ্ঞে আহুতি দেবার বদলে তা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়া বাড়তে থাকে। এই আর্থসামাজিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপটেই উপনিষদে গো-বলি ববা পশুবলির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়। এই নতুন ভাবনা আরো জোরালো রূপ নেয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসার তত্ত্বে। যজ্ঞকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে, কিন্তু মানুষের খাদ্যাভাসে রাতারাতি বদল ঘটে যায়, তা নয়। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও কয়েকবার মাংসাহার করেছিলেন, মহাবীরও পাখির মাংস খেয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। এও লক্ষণীয় যে, এই দুই ধর্মমত সামগ্রিকভাবে অহিংসার পক্ষেই কথা বলেছিল-গোরুকে সেখানে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গারুর উপর পবিত্রতা (Holiness)-ও আপোরিত হয়নি। খুব চিত্তাকর্ষক তথ্য হল, অহিংসার পূজারি সম্রাট অশোক অবধ্য প্রাণীদের যে-তালিকা তৈরি করেছিলেন, তাতে গোরুর নাম ছিল না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এও গো-হত্যা অপরাধ বলা হয়নি। মনু (খ্রিস্টপূর্ব ২০০-২০০ খ্রিস্টাব্দ) অহিংসার গুণের প্রশংসা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি খাদ্য হিসেবে যে প্রাণীদের তালিকা প্রস্তুত করেন, তাতে উটকে বাদ দিলেও গোরুকে বাদ দেওয়া হয়নি। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১০০-৩০০ খ্রিস্টাব্দ)-তে উল্লিখিত হয়েছে একজন শ্রোত্রিয় বব্রাহ্মণকে একটি বড়ো ছাগল বা ষাঁড় এবং মিষ্টি কথা দিয়ে অভ্যর্থনা করার কথা। রামায়ণ বা মহাভারতেও গোমাংস ভক্ষণের উদাহরণ পাব। ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন গো-মাংস (বাছুরের মাংস) পরিবেশন করে। মহাভারতে আছে, রাজা রন্তিদেবের রান্নাঘরে প্রতিদিন দুই সহস্র গোরু হত্যা করা হত এবং সেই রান্না তিনি ব্রাহ্মণদের বিতরণ করতেন। কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত-এ রন্তিদেবের এই কাহিনি উল্লেখ করেছিলেন গুপ্তযুগে বসে, এবং লক্ষণীয়-হিন্দুদের সেই তথাকথিত সুবর্ণযুগ-এ কোনো হিন্দুকেই কালিদাসের মুন্ডু চাই বলে হুঙ্কার দিতে দেখা যায়নি।

গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে শুরু করে মোটামুটি প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগ থেকে। ঐতিহাসিক দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা (যিনি এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন) বলছেন, আদি-মধ্যযুগে গ্রামীণ সমাজে রূপান্তর ঘটছিল কৃষির অভূতপূর্ব বিস্তার ও বাণিজ্যের সংকোচনের মধ্যে দিয়ে –এই প্রেক্ষাপটেই গো-হত্যা বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে দেখা যেতে পারে। আগগে কৃষি ছিল শুধুমাত্র বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট পেশা, কিন্তু এখন তা আর কেবল বৈশ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। এই সময় থেকে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান বা গ্রামদান

পারথার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল এবং কৃষি হয়ে উঠেছিল গরিব নিম্নবর্ণ থেকে শুরু করে ভূস্বামী পুরোহিত অভিজাতদেরও পেশা।

এই নতুন যুগ পুরাণ-এ কলিযুগ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সামাজিক রূপান্তরের পরিণামে পূর্ববর্তী যুগের সামাজিক/শাস্ত্রীয় বিধান এ যুগে অকেজে হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। ধর্মশাস্ত্রকাররা এই সময়েই আমদানি করলেন কলিবর্জ্য-র ধারণা-অর্থাৎ কিছু কিছু আচার বা রীতিনীতি অতীতে চালু থাকলেও কলিযুগে বর্জনীয় হিসেবেই বিবেচিত হবে। এই কলিবর্জ্য-র তালিকায় গোমাংস ব্রাহ্মণের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ল। ব্যাসস্মৃতি-তে একজন গো-হত্যাকারীকে স্পষ্টভাবে অন্ত্যজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসময় থেকেই গোমংস অস্পৃশ্যদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের অনুকরণে গোমাংস বর্জন হয়ে ওঠে জাতব্যবস্থার উপরে ওঠার অন্যতম মাধ্যম।

গো-হত্যা এবং গোমাংস সম্পর্কে এই পরিবর্তিত ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন আরো জোরালো হয়েছিল মধ্যযুগে ইসলামের আগমনের ফলে। মধ্যযুগীয় টীকাকাররা প্রায় সকলেই গোমাংস ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে মাধবাচার্য (চোদ্দো শতক), মদনপাল (চোদ্দো শতক), মদনসিংহ (পনেরো শতক) প্রমুখের কথা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু তাঁদের কলিবর্জ্য-র ধারণা পরোক্ষে এই স্বীকৃতি দেয় যে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের রীতি কলি-পূর্ব যুগে চালু ছুল। এবং মধ্যযুগেও নিম্নবর্ণ বা তথাকথিত অস্মৃশ্যদের মধ্যে তার চল বন্ধ হয়নি-না হলে বারংবার এবং জোরের সঙ্গে গোমংস বর্জনের কথা ধর্মশাস্ত্রগুলিতে উচ্চারিত হত না। এও উল্লেখ্য, কোনো কোনো জায়গায় হিন্দু পূর্জাচনার গোরু বলি ত্রি সেদিন পর্যন্ত চালু ছিল। রাজস্থানের টোডগড়ে গোরু ও মহিষবলির রীতিটি ১৮৭৪ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি।

আসলে, প্রাচীন যুগে নয়, মধ্যযুগেই গোরুর উপপর ধর্মীয় পবিত্রতা (holi ness) আরোপিত হয়। আমরা উল্লেখ করেছি, শিবাজি গোরুর এই পবিত্রতা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হতে পারে, গোরু নিয়ে পরস্পপরবিরোধী অবস্থানের কারণে হিন্দদু ও মুসলমান মধ্যযুগগে যুযুধান দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমরা জানি, বক্‌র ঈদে মুসলমানরা গোরু কুরবানি দেয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এটি কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। একটি ভেড়া বা ছাগল কুরবানিই একজন মুসলমানের কাছে যথেষ্ট। ভারতের মতো দেশে গোরু প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় ও সস্তা বলে গোরু কুরবানি জনপ্রিয় হল, যদিও সর্বত্রই তা প্রচলিত ছিল এমনটি বলা যায় না। এও উল্লেখ্য, মধ্যযুগের অনেক মুসলিম শাসক গোরু সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য আবেগকে মর্যাদা দিয়ে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এদের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, বা কাশ্মীরের শাসক জয়নাল আবেদিনের কথা বলা যায়। এ-থেকে এও মনে

হয়, স্থানীয় স্তরে গো-হত্যার বিষয়টি নিয়ে ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরির সম্ভাবনা ছিল, যা ওই শাসকরা এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনও গো-হত্যার বিষয়টি সাম্প্রদায়িক গণসমাবেশ (Mobilization)-এর বিষয় হিসেবে হাজির হয়নি-আর্য সমাজের উদ্যোগে গো-রক্ষা আন্দোলন সেই কাজটি করেছিল, এবং সূচনালগ্নেই কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম দিয়েছিল। ১৮৯৩ সালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে গো-রক্ষা আন্দোলন ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। দাঙ্গার বিচার করেত গিয়ে বিচারক এইচ. এল. এল. এলানসন উদ্‌ঘাটন করেছিলেন সার সত্যকথাটি-হিন্দুদাঙ্গাকারীরা সেদিন শুধুমাত্র কুরবানি বন্ধ করার লক্ষ্যেই চড়াও হয়নি, এ ছিলল খুব সচেতন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আবেগ থেকে সংগঠিত ও পরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র।[১]

কথাটা আজকের ক্ষেত্রেও বোধ হয় সমভাবে প্রযোজ্য। খুব নিরীহ ধর্মীয় আবেগ বা জীবপ্রেম থেকে গো-রক্ষার দাবিটি আজও উচ্চারিত হচ্ছে না। এর মধ্যে প্রবলভাবে উপস্তিত হিন্দুর এই দেশে মুসলমানদের টাইট দেবার হিন্দুত্ববাদী চিন্তা।

এই আলোচনা আমরা শেষ করব গোরক্ষা নিয়ে গান্ধিজি, নেহরু ও রবীন্দ্রনাথের মত উল্লেখ করে। মনে রাখতে হবে, গান্ধিজি সারা জীবন গো-সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। গোরক্ষার দাবিতে একাধিক সম্মেলনে সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন তিনি। খিলাফত আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং সেই সময় মুসলিম লিগ নেতারা তাঁকে কথাও দিয়েছিলেন গো-হত্যা থেকে মুসলিমদের বিরত করার জন্য। এই সাময়িক বোঝাপড়া অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে গিয়েছিল। মুসলিম লিক নেতারা গো-হত্যা বন্ধ রাখার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, মুসলমানদের ধর্মাচরণে সংখ্যাশুরু পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ হিসেবে-নিজের পছন্দের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশ অপর ধর্মের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা। ধর্মপ্রাণ গান্ধিজি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানের এই আবেগের যথার্থতা। স্বাধীনতার কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লিতে একটি প্রার্থনাসভার শেষে তিনি জানিয়েছিলেন-

> ভারতে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে কোনো আইন তৈরি হতে পারে না।...আমি অনেক দিন ধরে গো-সেবার কাজে শপথবদ্ধ, কিন্তু আমার ধর্ম কী করে বাকি ভারতীয়দের ধর্ম হতে পারে? এই আইনের অর্থ সেইসব ভারতীয়দের উপপর দমনপীড়ন, যাঁরা হিন্দু নন।

এবার আসি জওহরলাল নেহরুর কথায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৩ সালে প্রাদেশিক সরকারগুলি কাছে এক চিঠিতে তিনি লেখেন-

> গো-রক্ষণ গোরুকে রক্ষা করতেই পারে না। ভারতে গৃহপালিত পশুর নিরাপত্তা এবং তাদের উন্নত মান গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঘটতে পারে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনের অধিকারী হই। কোনো নঞর্থক সঙ্কীর্ণ মানসিকতা দিয়ে এমন প্রগতি হয় না।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথা, ঘরে-বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের মুখ দিয়ে যা তিনি বলিয়েছেন-

আমরা প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমার হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজে ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিলে না, সে ওদের উচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই। শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপর মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া, সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষি প্রধান, এ দেশে গোরু যে-

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুন্ডু মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি আবাধ্য হয় আর মোষ যদি আবাধধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধকার।

তথ্যসূত্র

১. মুশিরুল হাসান-এর Nationalism and communal Poolitics in India, (Manohar, 1994, Delhi) পৃষ্ঠা ২১৭ থেকে উদ্ধার

২. এই আলোচনা/নিবন্ধের মূল ভিত্তি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক D.N. Jhar-র গবেষণামুলক গ্রন্থ The Myth of the Holy Cow, Narayan, New Delhi, 2009